মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম ঃ মে ২০০১
তৃতীয় ঃ ফেব্রুয়ারী ঃ ২০০৭
মাঘ ঃ ১৪১৩
মহররম ঃ ১৪২৭

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা বশিরুল হক
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স (ওয়ালী উল্যাহ ভূইয়া)
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২/৩ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

[এই প্রবন্ধটি ১৯-৩-৮৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সুধী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণের ধারণকৃত টেপ থেকে নেয়া হয়েছে। ধারণকৃত টেপ থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন মোস্তাফা রশীদুল হাসান।]

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য

আজকের এই সুধী সমাবেশে আমি আপনাদের কাছে আমাদের এই সংগঠনটির[১] কাজ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দিতে চাই— পরিচিত করাতে চাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে। যদিও বহুদিন থেকে ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন স্তরের লোকদের নিকট এ সংগঠনটির চিন্তা-চেতনা, এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য, এর পন্থা-পদ্ধতি ইত্যাদি পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে নানাভাবে— পুস্তক আকারে, লেখনির মাধ্যমে, বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমেও— তবু আজ আমি এ বিষয়গুলো নিয়ে একটু খোলামেলা কথা বলতে চাই।

এ আন্দোলনের যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বলতে গেলে তা-ই ছিল আমার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য— যা আমি আমার বুকের মাঝে— আমার চিন্তা-চেতনায় দীর্ঘ দিন ধরে লালন করে আসছিলাম। আর তা হলো একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কায়েম করা, মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করা, সমস্ত শির্‌ক আকীদা থেকে— যাবতীয় কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করা। অন্যকথায় মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করবে, কেবল তাঁরই আইন বিধান মেনে চলবে, কেবলমাত্র তাঁরই একনিষ্ঠ গোলাম হয়ে জীবন যাপন করবে এবং দুনিয়া ও পরকালে মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট থেকে মুমিন হিসেবে তার প্রাপ্য বিনিময় বা পুরস্কার বুঝে নেবে—এমনি একটা সুযোগ ও সম্ভাবনা নিশ্চিত করাই ছিল আমার জীবনের লক্ষ্য।

অবশ্য এ জন্যে অতীতে বহু কাজ করা হয়েছে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে— সে কথা আপনারাও জানেন। কিন্তু সে আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার

১. সংগঠন বলতে বক্তা এখানে ইসলামী ঐক্য আন্দোলনকে বুঝিয়েছেন। —সম্পাদক

পূর্ণ হয়নি— বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। কেন পারিনি তার পিছনে অবশ্য বেশ কিছু কারণও ছিল। এর মধ্যে প্রধান যে কারণটি ছিল, যা আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, তাহলো যে প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বা সিস্টেম গ্রহণ করলে সে জিনিসটি লাভ করা যেত সেটা আমরা গ্রহণ করিনি। আমরা যদি সকলে এ ব্যাপারটি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে আমার বিশ্বাস আপনাদের কাছেও সব কিছু সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা জানি, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারেই একটি বিশেষ সিস্টেম, প্রক্রিয়া বা পন্থা-পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। সে প্রক্রিয়া বা পন্থা গ্রহণ না করলে সে জিনিসটি কোনোভাবেই লাভ করা যায়না। যেমন আকাশে মেঘ ছাড়া বৃষ্টির কল্পনা করা যায়না। বৃষ্টির দেখা পাওয়া যাবে যদি আকাশে মেঘ জমে— এটা বৃষ্টি আসার একটা পদ্ধতি বা সিস্টেম। দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে এই পৃথিবীতে, তার হিসেব করা মুশকিল। কিন্তু সে মানুষকেও দুনিয়ায় আসতে হয়েছে একটি সিস্টেমের মাধ্যমে। এ ছাড়া অন্য কোনোভাবে মানুষের দুনিয়ায় আগমন কল্পনা করা যায়না। এরপর দেখুন, আমরা এই যে ইবাদত-বন্দেগী করি তাও কিন্তু একটি সিস্টেমের মাধ্যমে করতে হয়। সে সিস্টেমে বা পদ্ধতিতে ভুল থাকলে বা ঘটলে সেই ইবাদতও আল্লাহ্‌র নিকট কবুলিয়াত লাভ করেনা বলে আমরা নিজেরা এর ব্যাখ্যা প্রদান করি। এরপর ধরুন, আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর কথা। এর কারণ হিসেবে আমরা জানি যে, মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে এই বিদ্যুৎ চমকানোর ঘটনাটি ঘটে। এখানে কারণ বা সিস্টেম হচ্ছে মেঘে মেঘে ঘর্ষণ। অর্থাৎ বিদ্যুৎ চমকানো আমরা দেখতে পাবো তখন যখন মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হবে— এছাড়া তা সম্ভব নয়। এরপর ধরুন, এই যে আমরা বিদ্যুৎ বাতি জ্বালাই বা পাখা চালাই, এখানে দুটি তার থাকে; এর একটি নেগেটিভ এবং অপরটি পজিটিভ। এভাবেই এর সংযোগ দেয়া হয়। এখন এখানে দুটি তারের পরিবর্তে যদি একটি তারের সাহায্যে বাতি জ্বালানোর কিংবা ফ্যান চালানোর চেষ্টা করা হয় এবং এই জন্য দুনিয়ার লক্ষ-কোটি মানুষ মিলিত হয়েও যদি চেষ্টা করে— তাহলে বলুন, এই বাতি কি জ্বলবে না পাখা ঘুরবে? একে অর্জন করতে হলে দুটো তারই লাগবে; কারণ এটাই হচ্ছে এর সিস্টেম বা পন্থা বা পদ্ধতি। যা-ই বলুন, এভাবে অনেক উদাহরণ একের পর এক দেয়া যেতে পারে।

কাজেই বলতে হয়, আমরা অতীতে যে কাজ করেছি তার পন্থা বা পদ্ধতিতে ভুল ছিল, যার কারণে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর য়াবত কাজ করেও কোনো রেজাল্ট বা ফলাফল আমরা দেখতে পাইনি বা দেখাতে পারিনি। তাই বলা যায়, কোনো কিছু চাইলেই যে পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সাথে তাকে পাওয়ার সঠিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করা না হবে। যদি সেটা করা হয় তবেই হয়তো আমরা তার আশা করতে পারি— অন্যথায় নয়।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে এতদিন ধরে দেশে যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে কাজ করা হয়েছে সেটা ছিল পশ্চিমী ধাঁচের গণতান্ত্রিক পন্থা। এখনও এ পদ্ধতিতে অনেকে কাজ করছেন। এখানে যে সিসটেম রয়েছে তাতে ভোটাভুটির ব্যবস্থা রয়েছে, নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে, পার্লামেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে এবং পরবর্তী সরকার গঠন করার ব্যবস্থা রয়েছে ইত্যাদি। দীর্ঘকাল ধরেই এ সব কিছু হচ্ছে এবং হয়ে আসছে এবং যারা এ পদ্ধতিতে কাজ করছেন তারা এরই ফল পাচ্ছেন। কেননা গণতান্ত্রিক সিসটেমের এটাই পন্থা এবং এটাই পরিণতি। এখানে অন্য কোনো জিনিস আশা করা মূর্খতারই লক্ষণ। কারণ মুখে যতই আমরা ইসলামের কথা বলিনা কেন, কার্যত প্রক্রিয়া বা পন্থা যা অবলম্বন করা হয়েছিল সেটা ইসলামের ছিলনা; তাই ইসলাম হয়নি। কোনো একজন বিধর্মী যদি কাঁঠাল গাছ উৎপন্ন করার জন্যে কাঁঠালের বীজ বপন করে তাহলে সেখানে কাঁঠাল গাছই উৎপন্ন হবে এবং ফল হিসেবে সে কাঁঠালই পাবে; আম বা অন্য কোনো ফল সে গাছে উৎপন্ন হবেনা— এটি একটি চিরাচরিত কথা। সেভাবে দাড়ি-টুপি-পাগড়ী নিয়ে যদি কোনো মুসলমান ঐ কাঁঠালের বীজ বপন করে তবে সেও একই ফল পাবে; তার পক্ষে অন্য কিছু আশা করা আহাম্মকী ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। তাই বলছি, যেখানে সব রাজনীতিক মহলই কাজ করছে গণতন্ত্রের জন্য, আবার এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার জন্যে নতুন নতুন টেকনিকও এখানে অবলম্বন করা হচ্ছে। সেখানে দাড়ি-টুপি-পাগড়ী নিয়ে একই পন্থা অবলম্বনকারী লোকেরা যদি বলে আমি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করছি তাহলে তাকে পাগল বা নির্বোধ বললে কি খুব বেশি বলা হবে? সুতরাং দেখা যায়, সব রাজনীতিকই চাচ্ছে গণতন্ত্র, আর হচ্ছে গণতন্ত্র— প্রকৃতপক্ষে ইসলাম তো কেউ চাচ্ছেনা; তাই ইসলাম হচ্ছে না। অথচ ইসলামের নামধারী কিছু লোক কিভাবে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে ইসলামেরই নাম নিয়ে!

একথাটি পরিষ্কারভাবে অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও আমরা বুঝতে পারছি এবং এ জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করছি। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলে পারছিনা তা হলো, গণতান্ত্রিক মতবাদ কোনো খোদায়ী বিধান নয়, এটি মানুষের তৈরী একটি মতবাদ, যেখানে আল্লাহ্‌কে নানাভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলতে গেলে, এটি একটি কুফরী ও অপবিত্র মতবাদ। পক্ষান্তরে দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া একটি বড় নেয়ামত এবং অতি পবিত্র। পবিত্র এই জিনিসটিকে অপবিত্র পন্থায় হাসিল করতে চাওয়াটা হচ্ছে আরও বড় অপরাধ— বড় পাপ, যা আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয়; এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হচ্ছে দ্বীন কায়েম না হওয়ার আর একটি কারণ। পরন্তু আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম করা একটি বড় ইবাদত; সে ইবাদত আল্লাহ্‌র প্রবর্তিত পন্থা ছাড়া হতে পারেনা।

এখানে লোকদের মাঝে আর একটি জিনিস কাজ করে, তা হলো দলের আকার এবং তার মধ্যে লোক সংখ্যার আধিক্য। দলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক থাকতে হবে, তাহলে মানুষের মনে আশা জাগবে যে, ঐ দল কিছু করতে পারবে। দলে যদি অনেক লোক বা সমর্থক না থাকে তাহলে বলা হবে, নাহ্! এদের দ্বারা কিছুই হবেনা। একারণে অনেকে এও বলে থাকেন যে, আমাদের শক্তি বা দলের কি পরিমাণ লোক আছে, তা যাচাই করার জন্যে নির্বাচন করতে হয়। এর ফলে দেখা যায় যে, মানুষের মনে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে মানুষের ওপর একটি নির্ভরশীলতা এসে যায়। অমুক দলে এতো লোক, এতো কর্মী, কিছু করতে পারলে এরাই পারবে—. এধরনের একটি ধারণা জন্মানো হয়। আবার যাদের দলে কর্মী বা সদস্য কম থাকে তারা কোনো কাজ করতে সাহসই পায়না। এভাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে মানুষের ওপর মানুষ চরমভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা বলতে গেলে হারিয়ে ফেলে— শেষ হয়ে যায়।

আমরা যদি দুনিয়ার ইতিহাস খুলে দেখি তাহলে দেখতে পাব, দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিজয় একান্তভাবে তাঁর মর্জি এবং সাহায্য ছাড়া কোথাও অর্জিত হয়নি— কামিয়াবি আসেনি। নবী-রাসূলগণের ইতিহাস এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিজয় দেখতে চাই তাহলে রাসূলে করীম (স)-এর পন্থা বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কেননা কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَا تَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ -

বলুন, হে নবী! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন। (আলে-ইমরান ঃ ৩১)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্যে কি করণীয় তার একটি গাইড-লাইন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পেতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলে করীম (স)-এর অনুসরণ করতে হবে। মানুষ তার জীবনের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি ব্যাপারে, প্রতিটি কাজে একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করে চলবে, তবেই সে পথের দিশা পাবে, নয়তো সে সঠিক পথ হারিয়ে কোনো ভুল পথে চলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এ কারণেই যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে, পথহারা মানুষ যেন পথ খুঁজে পায়। কোন পথে চলতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, কোন কাজ করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে— এর সব কিছুই আমরা রাসূলে করীম (স)-এর জীবন থেকে নিতে পারি তাঁকে অনুসরণের মাধ্যমে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ উপলব্ধি আমাদের মাঝে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরতেই থাকব। আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো আর সম্ভব হবেনা।

আমাদের বক্তব্য হলো, অতীতে যে ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে আমাদের সময় কেটেছে সেটিকে আজ শুধরে নিতে চেষ্টা করছি। আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় পন্থায়, রাসূল করীম (স)-এর সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে আমরা এই আন্দোলন সংগঠিত করেছি। তাই এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সকল সদস্য-সমর্থক এবং সহানুভূতিশীলদের কাছে আমার আবেদন হলো— যারাই এই সংগঠনের সাথে একাত্ম হবেন তারা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে একে গ্রহণ করবেন; দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে আমাদের এ দাওয়াতকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টিত হবেন— এই আশা আমরা রাখি।

এই দুনিয়ায় আন্দোলন বলতে বহু প্রকারের, বহু ধরনের তৎপরতা চলছে। আন্দোলন মানব জীবনের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়— একটি স্বাভাবিক জিনিস। কেননা আন্দোলন ছাড়া মানুষ থাকতে পারেনা। কোনো-না-কোনোভাবে তাকে আন্দোলনে নিরত থাকতে হয়। এই আন্দোলনটা কিন্তু গড়ে ওঠে কোনো চিন্তার ভিত্তিতে, কোনো দর্শনের ভিত্তিতে বা কোনো মতের ভিত্তিতে— সে মত ভালো

হোক কিংবা মন্দ হোক। কাজেই সে চিন্তাকে যারা নিজেদের চিন্তা হিসেবে গ্রহণ করে আর সে চিন্তা থেকে যে বিশ্বাস বের হয়ে আসে, সে বিশ্বাসকে যারা নিজেদের বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করে, তারা সেই বিশ্বাসকে দুনিয়ার বুকে বাস্তবায়িত করার জন্যে— বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে; এমন কি সেই চিন্তা-বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় না— প্রয়োজনে সব কিছু ত্যাগ করতে তারা সদা প্রস্তুত থাকে। দুনিয়ার ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি নজির দেখা যাবে। মানুষের ইতিহাসে এর নিদর্শন অতীত কাল থেকে চলে আসছে; বর্তমান সময়েও আমরা এর নজির দেখতে পাচ্ছি। আমাদের চার পাশেই বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে বিভিন্ন দল, বিভিন্ন ব্যক্তি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই চেষ্টার মূল কারণ হলো তাদের মনের তাগিদ। মন মগজ থেকে উদ্ভুত চিন্তার ভিত্তিতে যে সত্যকে তারা সত্য বলে গ্রহণ করে সে সত্যকে নিজেরা প্রথম অনুসরণ করে, তারপর তাকেই আবার সমাজের বুকে বাস্তবায়িত করার জন্যে নিজের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে। এটাই মানুষের স্বভাব— তার প্রকৃতি।

আমরা এই বাংলাদেশের জমিনে যা কিছু করতে চাই, যা আমাদের লক্ষ্য-আদর্শ সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আমরা চাচ্ছি কিছু সংখ্যক লোক এই সমাজ থেকে এমনিভাবে বের হয়ে আসুক যারা আমাদের এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন। এর কর্মনীতিকে একমাত্র সঠিক কর্মনীতি হিসেবে বুঝবেন এবং মনে প্রাণে তা গ্রহণ করবেন। অতঃপর নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে তাকে প্রতিফলিত করার জন্যে চেষ্টা চালাবেন। চেষ্টা চালাবেন তাকে নিজ পরিবারে, নিজ সমাজে এবং যে রাষ্ট্রে আমরা বসবাস করি সেই রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে। আমাদের এই চেষ্টাটা নিছক মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে নয়; কিংবা শুধু মনের তাগিদেই আমরা করছি এমনও নয় বরং এর সাথে ওপর থেকে আসা একটা তাগিদেরও ব্যাপার রয়েছে। আমরা যে জগতে বসবাস করি, সে জগতের যিনি স্রষ্টা তিনি আমাদের ঐ কথা বলতে বলেছেন, যে কথা আমরা বলছি। সেই উদ্দেশ্যে আমরা কাজ করছি যে উদ্দেশ্যে তিনি কাজ করতে বলেছেন। এ বিষয়ে আমাদের মনে আর কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ নেই। আমরা আল্লাহ্‌র কালামকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য জানার এবং আল্লাহ্‌র বিধানকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র চূড়ান্ত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছি। আর সে কালাম থেকে যা প্রমাণিত তা-ই আমরা করতে চাচ্ছি।

আমরা আজকে এখানে যারা একত্রিত হয়েছি তারা কোনো এক ব্যক্তির ভক্ত বা কোনো এক পীরের মুরিদ হিসেবে একত্রিত হয়েছি এমন নয়। অথবা নয় এটা কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেখানে কিছু ব্যবসায়ী একত্রিত হয়েছি। কিংবা নয় এটা কোনো ডিপার্টমেন্টের অফিস যেখানে তার কর্মচারীরা একত্রিত হয়েছি। এখানে এই কথাটি সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার যে, আমরা এ ধরনের কোনো সংস্থা করিনি বা খুলিনি।

আমরা একটি চিন্তা-বিশ্বাসকে ভিত্তি করে সংগঠিত হতে চেষ্টা করছি। সুতরাং যারা সেই চিন্তার সাথে একমত, যারা এই চিন্তাকে নিজের চিন্তা হিসেবে, এই বিশ্বাসকে নিজের বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করেছেন আমি মনে করি তারাই এখানে একত্রিত হয়েছেন। আর ভবিষ্যতেও যারা এর সাথে শরিক হবেন তারা এই মতের সাথে, এই চিন্তার সাথে, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেই এর পতাকা তলে সমবেত হবেন। সেক্ষেত্রে এর চিন্তাই হবে তাদের চিন্তা, এর বিশ্বাসই হবে তাদের বিশ্বাস। তবেই হয়তো তাদের পক্ষে আমাদের সঙ্গে আসা, আমাদের সঙ্গে থাকা, আমাদের সঙ্গে চলা সম্ভব হবে।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন, আপনাদের এই সংগঠন কি চায় ? জবাবে আমি বলতে চাই, আমাদের এই দেশের জন-জীবনে, পারিবারিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, এর অর্থনৈতিক জীবনে— অর্থাৎ জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানকে আমরা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে চাই। প্রসঙ্গত একটি কথা মনে রাখা দরকার, আমরা ইসলামকে কোনো ব্যক্তির বা কোনো সংগঠনের নেতার কাছ থেকে কিংবা কোনো পীরের কাছ থেকে নেইনি। আমরা ইসলামকে আল্লাহ্‌র কুরআন এবং কুরআন ব্যাখ্যা করার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত থেকেই সরাসরি গ্রহণ করেছি। সে ইসলাম মানব জীবনের নির্দিষ্ট কোনো একটি দিককে কিংবা কোনো একটি বিভাগকে গ্রহণ করেনি বরং তা মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগকে গ্রাস করেছে। মানব জীবনের যত দিক আছে, যত বিভাগ আছে, যত কাজ আছে, সর্বক্ষেত্রের জন্যে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে যে মৌলিক বিধান দিয়েছেন আর সর্বশেষ নবী ও রাসূল দ্বারা তার যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়েছেন, তাঁর আমল দ্বারা সম্পাদিত যে ব্যাখ্যা বিবরণ আমরা পাই হাদীস থেকে— তাকেই পুরোপুরি গ্রহণ করতে চাই। এই কুরআন মজীদ বিশেষভাবে এবং রাসূলের সুন্নাত যা

আমরা বুঝেছি— তা নতুন কিছু নয় আর কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলামকে গ্রহণ করার নীতি-পদ্ধতিও আজকের দুনিয়ায় নতুন নয়। যে দিন থেকে এ কুরআন নাজিল হয়েছে সেদিন থেকে এ পদ্ধতিও চালু হয়ে আসছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বিগত ১৪০০ বছর ধরে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে এবং এর ওপর বহু চিন্তা-গবেষণাও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হাদীসেরও চর্চা করা হয়েছে এবং এর থেকে মানুষের কর্মজীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান বের করা হয়েছে। এই কুরআন ও হাদীসকে ভিত্তি করে মানুষ যে মহামূল্য সাধনা গবেষণা করেছে তার ফলও আমাদের সামনে রয়েছে আর তারই আলোকে আমরা আমাদের এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছি। এই মৌলিক উদ্দেশ্যকেই আমরা গ্রহণ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা— সারে জাহানের রব্ব। তিনি সারে জাহানকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, মানুষকেও তিনি বিনা উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেননি বরং তাকে বিশেষ মর্যাদা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। এই দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের জন্য তিনি একটি ধরন-ধারণ, একটি নিয়ম-নীতি চালু করে দিয়েছেন— দিয়েছেন যেমন আসমানের প্রতিটি জিনিসের জন্যে তেমনি জমিনেরও প্রতিটি জিনিসের জন্যে। অনুরূপভাবে মানুষের জন্যেও একটি নিয়ম-নীতি বা একটি বিধান নাযিল করেছেন। আর সে বিধানেরই নাম হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার এই ঘোষণা ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -

জীবন যাপনের যে ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় তা-ই হচ্ছে ইসলাম।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে একমাত্র বিধানই হচ্ছে ইসলাম। এ কথাটি কেবলমাত্র মানুষের জন্যেই প্রযোজ্য নয় বরং বস্তু জগতেরও প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যে প্রযোজ্য। বস্তু জগতে এমন কোনো একটি জিনিস পাওয়া যাবেনা যেখানে আল্লাহ্‌র আইন-বিধান চালু নেই। জমিনের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধুলিকণা থেকে শুরু করে বড় বড় পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত, আকাশের চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ—নক্ষত্র, ছায়াপথ ও নীহারিকায় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আইন-বিধান চালু রয়েছে। মানুষ এই মহাবিশ্বের একটি অংশ মাত্র আর পৃথিবী এই মহাবিশ্বের মধ্যে একটি গ্রহ মাত্র। এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র একটি অংশে বসবাসরত এই যে মানুষ আজকে তার সংখ্যা

যা-ই হোক না কেন, দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় যার সংখ্যা অনেক কম— সেই মানুষও আল্লাহ্‌র সেই বিধান মেনে চলতে বাধ্য— যে বিধান সারে জাহানকে চালাচ্ছে; তারই কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য যার কাছে নত হয়ে আছে গোটা বিশ্বলোক; আর তারই নাম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম মানে আত্মসমর্পন করা, নিজেকে নত করে দেয়া, নিজেকে কারো অধীন বানিয়ে দেয়া— যে অধীনতা বিনা বাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছে এই সৃষ্টি জগত। সৃষ্টিলোকের অংশ হিসেবে আমাদেরকেও সে অধীনতা স্বীকার করে নিতে হবে বিনা বাক্যে— আল্লাহ্‌র বিধান বিশ্বাস করা, তা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা এবং তাকে কার্যত পালন করার মাধ্যমে। মানুষ হিসেবে এটাই আমাদের দায়িত্ব এবং এটাই আমাদের কর্তব্য।

আল্লাহ্‌র বিধান কোনো এক-পেশে ব্যবস্থা নয়। ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ্‌র বিধান মানা হবে আর পারিবারিক জীবনসহ সামষ্টিক জীবনের কোনো দিকেই আল্লাহ্‌র বিধান পালিত হবেনা, এ রকম কোনো বিধান ইসলাম নয়। সে দিক দিয়ে আমি বলব, ইসলাম সে ধরনের কোনো ধর্মই নয়। ধর্ম বলতে যে জিনিসটিকে বুঝায়, ইংরেজিতে তাকে বলে রিলিজিয়ন (Religion)। এব্যাপারে ইউরোপ থেকে যে ধারণা এসেছে তা হলো, স্রষ্টার সাথে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এটাকেই ধর্ম বলা হয়। কাজেই তা সে পালন করবে কি করবেনা, রাখবে কি রাখবেনা, রাখলেও সে তা কিভাবে রাখবে বা কতখানি রাখবে সেটা ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্রষ্টাকে ডাকা বা সম্বোধন করা, তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখা বা তাঁর এবাদত-বন্দেগী করা— এসব কিছুই ব্যক্তির নিজের ওপর নির্ভর করে। আর এ কারণেই সে ব্যক্তির পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন এবং অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে রিলিজিয়ন (Religion) কোনো কথা বলেনা বা কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনা কিংবা রিলিজিয়ন তাকে কোনো নীতি-আদর্শও দেয়না।

কিন্তু ইসলাম সে-ধরনের কোনো রিলিজিয়ন বা ধর্ম নয়। এই কথাটি— এই ধারণাটি আমাদের সকলের নিকট সর্বপ্রথম পরিষ্কার হওয়া দরকার। কেননা এই বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা না থাকলে সামনে অগ্রসর হওয়া যায়না এবং কোনো কাজও ঠিকভাবে করা যায়না। আজকে আমাদের সমাজে এই যা কিছু হচ্ছে অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে মানা হচ্ছে আবার অন্য ক্ষেত্রে

তাঁকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে— এ ধরনের আচরণ ছিল ইহুদীদের। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ -

তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো আর অপর অংশকে করা অবিশ্বাস? জেনে রেখো তোমাদের মধ্যে যারাই এইরূপ আচরণ করবে তাদের এছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা বাকারা ঃ ৮৫)

উপরিউক্ত আয়াতটি যদিও ইহুদীদের লক্ষ্য করে নাজিল হয়েছিল; কিন্তু তারা খোদায়ী দ্বীনের সাথে যে চরমভাবে আচার-আচরণ এবং যে ব্যবহার করত বলতে গেলে সে রকমই আচরণ আমরা করে যাচ্ছি; সেই একই আচরণ আমাদের সমাজে বিরাজমান আমাদের দ্বীনের সাথে অর্থাৎ ইসলামও আজ রিলিজিয়ন হয়ে ধর্মের আকারে আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে। তাই আমরা আমাদের সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবিদের মুখ থেকেও ধর্মের সংকীর্ণ ভূমিকার কথা অহরহ শুনতে পাই। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই পাড়েন এবং বৃহত্তর জীবনে ইসলামের আরোপিত যে বাধ্যবাধকতা তা মেনে নিতে রাজি নন। এই কারণে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের কিছু কিছু অনুশাসন হয়তো কেউ কেউ মেনে চলেন কিন্তু সামষ্টিক জীবনে ইসলামের কোনো পরোয়া তারা করেন না। আসলে এর মূল কারণ খুঁজলে দেখা যাবে— দীর্ঘ দুশো বছর এদেশের জনগণ বৃটিশদের যে গোলামী করেছে, তাদের যে আনুগত্য করেছে এবং তাদের যে চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক হয়েছে— এসব তারই ফসল। কেননা তখন ইসলামকে সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করার কোনো সুযোগ ছিলনা। তখন ইসলামের যা কিছু পালন করা হয়েছে ব্যক্তিগতভাবেই করা হয়েছে, সামষ্টিকভাবে তা পালনের কোনো সুযোগ ছিলনা। পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু একটি মুসলিম দেশ হিসেবে— জাতি হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, ক্ষমতাসীনরা তা অনুভব করতে পারেনি। ফলে দেখা যায়, ইসলামকে এদেশের মানুষ ধর্ম হিসেবেই ব্যবহার করে আসছে কিন্তু দ্বীন হিসেবে তা এখানে স্বীকৃতি পায়নি।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে দ্বীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দ্বীন অর্থ পন্থা প্রণালী, ধর্ম নয়। আরবী পরিভাষায় দ্বীন অর্থ বুঝায় আচরণ-বিধি। এক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে কি কি নিয়ম-বিধি অনুসরণ করবে, তার পারিবারিক জীবনে স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সাথে, তার পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে কি আচরণ থাকবে— তার সুনির্দিষ্ট বিধান আছে এখানে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার লেন-দেন, তার আয়-উপার্জন এবং তার ব্যয়-ব্যবহার করা ইত্যাদিতে সে কোন নীতি অবলম্বন করবে— তার বিধানও এখানে দেয়া আছে। অন্য লোকের সাথে মিলিত হয়ে তার সামাজিক জীবন যাপন করা, আর এই সামাজিক জীবনে লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা বা না রাখা, বন্ধুতা করা বা শত্রুতা করা— এসব কিছু কোন্ নীতি অনুযায়ী হবে এবং সেই সমাজ সংস্থায় তার কি অধিকার বা মর্যাদা আছে, তার প্রতি সমাজের দায়িত্ব কি, সমাজের প্রতি তার কর্তব্য কতখানি, তার কি অধিকার আছে সমাজের ওপর, সমাজের কি অধিকার আছে তার ওপর— এই সব বিষয়েই ইসলাম বিধান দিয়েছে। তারপর এই সমাজকে পরিচালনা করার জন্যে যে একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দরকার, যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের জীবন চলতে পারেনা— সে সম্পর্কেও ইসলামের হুকুম রয়েছে, বিধান রয়েছে। এ কারণেই ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা হয়েছে।

মার্ক্সীয় দর্শনে অবশ্য সুদূর অতীতের এমন একটি সময়ের কথা বলা হয়, যখন রাষ্ট্র বলতে কিছুই ছিলনা। হাঁ, রাষ্ট্র বলতে আধুনিক ভাষায় যে সংস্থাটির ক্রমবিকাশ ঘটেছে— ক্রমশ ডেভেলপ করেছে, ঠিক সে ধরনের রাষ্ট্র হয়তো প্রাচীন কালে ছিলনা, তবে রাষ্ট্রের কোনো-না-কোনো রূপ মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল—ছিল একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মতো, যেখানে বহু লোকজন বসবাস করে। সেখানকার শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে কোনো-না-কোনো রকমের প্রশাসনিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা অবশ্যই ছিল।

কুরআন মজীদ থেকে আমরা যে ইতিহাসের সন্ধান পাই— তাতে হযরত আদম (আ) এই দুনিয়ার প্রথম পুরুষ এবং হযরত হাওয়া (আ) প্রথম নারী। এই দুনিয়ায় তাদের বংশধরেরাই হলো সর্বপ্রথম মানুষ। সে বংশধরেরা ৪০ জোড়া হোক কিংবা তার বেশিই হোক, এদের নিয়েই প্রথম মানব সমাজ গঠিত হয় এবং সে সমাজ সম্পর্কেও বলা হয় যে, তাদের মধ্যে কোন রকম প্রশাসনিক এবং সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপনের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। সে সময় থেকে আরম্ভ করে

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কতো মানুষ এসেছে এবং তাদের ইতিহাসও কত লম্বা ইতিহাস। কত কোটি কোটি, কত মিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ এসেছে— গুণে হয়তো তা শেষ করা যাবেনা। মানুষের এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে অব্যাহতভাবে। সে মানুষ যে অবস্থায়ই এই দুনিয়ার বুকে থাকুক না কেন, তাকে কোনো-না-কোনো একটি সামাজিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়েছে। এমন কি জঙ্গলে যে পশুরা বসবাস করে তাদেরও নিজস্ব জগতে বলতে গেলে কোনো-না-কোনো রকমের মান্যতা (Supremacy) অর্থাৎ কারো-না-কারো কর্তৃত্ব বা প্রভূত্ব থাকাটা স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে বিচার করলে মানুষের জন্যেও স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকা একান্তই প্রয়োজন। আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে কোনো মানব সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়না যেখানে কোনো-না-কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই বা গড়ে ওঠেনি।

এদেশে আমরাও একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি। সে প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা কি রকম? তার ওপর আমাদের কি অধিকার আছে? তারই বা কি অধিকার রয়েছে আমাদের ওপরে? এসব কিছু আমাদের জানতে হয়, বুঝতে হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এসব জানা বুঝাকেই রাষ্ট্র বিজ্ঞান বলা হয়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে একে অর্থনীতি বলা হয় আর সামাজিক দৃষ্টিতে একে সমাজ-দর্শন বলে। এছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাও রয়েছে; কিন্তু মূল জিনিস একটাই আর তা হলো মানব সমাজ এ দুনিয়ায় কি করে বসবাস করবে। তার যে বিভিন্ন দিক ও বিভাগ রয়েছে, সে সকল দিকের প্রতি তার সম্পর্কটা কি? বা সে দিকগুলোর সাথে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যই বা কি? সে সবের ওপর তার অধিকার কি ইত্যাদি।

এই যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম এই সকল ক্ষেত্র ও বিভাগে আমরা ইসলামকে বাস্তবভাবে প্রয়োগ করতে চাই। মনে রাখবেন, ইসলাম নিছক কোনো দো'আ-তাবিজের ব্যাপার নয় কিংবা কিছু মুরাকাবা মুশাহদার ব্যাপারও নয়। অনুরূপভাবে কিছু দরূদ শরীফ কিংবা কিছু মিলাদ শরীফের ব্যাপারও নয় কিংবা নয় কিছু সওয়াব রেসানির ব্যাপারও। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে যা যা আইন হিসেবে জারী করা হবে তার সব কিছু প্রয়োগ করা হবে মানুষের জীবনের ওপর। চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ সেটাকে মেনে চলবে,

নিজের জীবন আচরণে তাকে মেনে চলবে— নিজের সমাজ পরিবেশে তাকে মেনে চলবে। এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, যে রাষ্ট্র এসকল বিধি-বিধান মেনে চলবে এবং তদনুযায়ী সে নিজে চলবে এবং অন্যদেরকেও চালাবে। জনগণের যে অধিকার আছে রাষ্ট্রের ওপর সে অধিকার সে পূরণ করবে, আবার রাষ্ট্রের যে কর্তব্য আছে জনগণের ওপর সে কর্তব্য রাষ্ট্র পালন করবে। এই যা কিছু সম্পর্কের কথা বললাম তার সব কিছুই নির্মাণ করতে হবে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী। আমরা যে কালেমা পড়ি সে কালেমা রাষ্ট্রকেও পড়তে হবে। কেননা কালেমা আমাদেরকে যে মূলনীতি, যে মূল দর্শন আমাদের দেয় তাতে মানব জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করার পূর্ণ অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই— থাকতে পারেনা, যে কর্তৃত্ব এখন মানুষের ওপর রাষ্ট্র করছে। এ কারণে রাষ্ট্রকেও সর্বতোভাবে এক আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্র যদি কালেমা না পড়ে, সে যদি কালেমা অনুযায়ী আচরণ না করে তার জনগণের ওপর, নাগরিকরা সেখানে কালেমা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারেনা।

বলা বাহুল্য, রাষ্ট্র আসমান থেকে নিয়ে আসা কোনো জিনিস নয় এবং তা মানুষের সাথে সম্পর্কহীন কোনো জিনিস নয়। রাষ্ট্র মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক-কথায় বলা যায়, মানুষ নিয়েই রাষ্ট্র আবার রাষ্ট্র দ্বারাই মানুষ নিয়ন্ত্রিত— পরিচালিত। অতএব মুসলমানদের রাষ্ট্রকেও সেই কালেমা পড়তে হবে এবং তাকে পূর্ণভাবে তা মেনে চলতে হবে। কালেমার ভিতর যা যা অস্বীকার করা হয়েছে তাকে তা অস্বীকার করতে হবে। এর মধ্যে যা যা স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তাকে তা স্বীকার করে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে।

এ কারণেই এমনি একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা আমরা একান্তভাবে জরুরী বলে মনে করি। এখানে রাষ্ট্র নিজে আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে স্বীকার করে তাঁর বিধানকে অনুসরণ করে সমস্ত মানুষের ওপর তা কার্যকর করবে। মুসলমানদের রাষ্ট্র নিজের রচিত কোনো আইন— নিজের মর্জিমত বানানো কোনো বিধান মানুষের ওপর কার্যকর করবে না; আল্লাহ্‌রই দেয়া বিধান অনুযায়ী সে মানুষকে গড়বে, তার ব্যক্তিগত জীবন গড়বে, তার সামাজিক জীবন গড়বে; পারিবারিক জীবন গড়বে, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন গড়বে, সে অনুযায়ী শিক্ষা

ব্যবস্থা চালু করবে, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। শুধু তা-ই নয়, মানুষ যেন আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন-বিধান অনুযায়ী শাসিত হয় সে দিকেও সে গভীর দৃষ্টি রাখবে। এটাই হবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

এখন এ দায়িত্ব যদি রাষ্ট্র পালন করে তাহলে তার অধীন যত মানুষ আছে তাদের পক্ষে মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করা সম্ভব— ইসলাম পালন করা সম্ভব পূর্ণাঙ্গভাবে। আর যদি রাষ্ট্র নিজেই তা পালন না করে বরং সে এর বিপরীত দিকে চলতে থাকে তবে তার অধীন মানুষের জীবন ইসলাম অনুযায়ী হতে পারেনা। আমাদের দেশের বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করলেই এর সত্যতা সকলের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এদেশের জনগণ অধিকাংশই মুসলমান। তারপরও আমরা আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুসারে শাসিত হচ্ছিনা। উপরন্তু অঘোষিতভাবে আল্লাহ্‌র বিধানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, অমর্যাদা করা হচ্ছে— মূল্যহীন মনে করা হচ্ছে। এখানে মুসলমান নামধারী এমনও লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে সহ্য পর্যন্ত করতে পারছেনা।[১] ইসলামের কথা বললে, ইসলামী আইন ও শাসনের কথা বললে তারা এমনভাবে ক্ষেপে যায়, মনে হয় যেন তাদের সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে।

আমাদের সমাজে শান্তি বলতে কিছু নেই। মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা-ধর্ষণ, লুটপাট, চুরি-ডাকাতি, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি— কি নেই এখানে। প্রায় প্রতিদিন এখানে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। একজন মানুষ তারই মতো আর একজন মানুষকে সহ্য করতে পারছেনা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব-কলহ ঠকবাজি মাস্তানিতে ভরে গেছে সমাজ। এখানে নির্বিঘ্নে কেউ পথ চলতে পারছেনা। রাস্তায় বের হলে সহি-সালামতে কেউ ঘরে ফিরবে এর নিশ্চয়তা বলতে কিছু নেই। এখানকার অফিস আদালতের সর্বত্র চলছে ঘুষের ছড়াছড়ি। ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়েনা বলে সহজে কোনো কাজও করা যাচ্ছেনা। সবখানেই একটা অরাজকতা ছড়িয়ে আছে— ফলে মানুষ শান্তি পাচ্ছেনা। এরপরও যারা সরকারে থাকেন তাদেরকে বলতে শোনা যায়— দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে, দেশের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান; কোথাও কোনো অসুবিধা নেই— সব ঠিক-ঠাকই চলছে।

১. এমন কি, মুসলমান নামধারী ব্যক্তিরা পশ্চিমের ইহুদী-খ্রিস্টানদের অনুকরণে ইসলামী মূল্য বোধকে মৌলবাদ বলে বিদ্রূপ করতেও দ্বিধাবোধ করছেনা, যদিও ইসলামের সাথে মৌলবাদের কোনো সম্পর্কই নেই। —সম্পাদক

একটি কথা সকল মানুষকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র আইন-বিধান দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মানুষের দ্বারা মানুষ শোষিত-নির্যাতিত এবং সর্বদিক দিয়ে বঞ্চিত হতে থাকবে। সমাজে কোনোদিন শান্তি ফিরে আসবেনা। কেননা আল্লাহ্‌র আইন সকল মানুষের ওপর সমানভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। সেখানে কে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী আর কে শ্রমিক বা মালিক— তার পার্থক্য নির্ধারণের সুযোগ নেই। অপরাধ করলে সেখানে শাস্তি একই রকম। মানুষ সেখানে সত্যিকারের ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হয়না। কেননা আল্লাহ্‌র আইন কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা— পারেনা এতে কেউ কম-বেশি করতে বা নিজের সুবিধামতো কিছু সংযোগ করতে। দুনিয়ার কোনো মানুষের এই অধিকার নেই যে, এতে একটি জের বা জবর পরিবর্তন করে। কেয়ামত পর্যন্ত তা এমনি অপরিবর্তনীয় থাকবে।

অন্যদিকে মানুষ যখন মানুষের জন্যে আইন-বিধান তৈরি করে তখন প্রথমেই তারা নিজেদের সুবিধামতো আইনের বাঁক-বিন্যাস করে। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন মনে করলে তারা নিজেদের ইচ্ছামতো তাতে রদ-বদল করে ফেলে। অর্থাৎ যার যার সুবিধামতো আইন বানিয়ে নেয়। তাইতো দেখা যায়— এক এক সরকারের আমলে এক এক রকম আইনের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এক সরকারের পক্ষে যেটা ভালো, অন্য সরকারের পক্ষে সেটা খারাপ। এক সরকারের আমলে যেটা হালাল, অন্য সরকার এসে সেটাকে হারাম ঘোষণা করে। এ ধরনের নিয়ম-নীতি যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে; স্থায়িত্ব বলতে কোনো জিনিস এখানে নেই। তাই মানুষের জন্যে প্রয়োজন এমন একটি স্থায়ী আইন, এমন একটি স্থায়ী নিয়ম-নীতি যে, সরকারের আগমন বা প্রস্থানের ফলে তাতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হবে না। আর এমনই একটি স্থায়ী ও মজবুত আইন কেবল ইসলাম দেয়, অন্য কেউ দেয়না— দিতে পারেনা।

আইন সম্পর্কে ইসলামের দর্শন হচ্ছে ঃ আইন তারই হতে পারে যার প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব চলছে গোটা বিশ্ব-জগতের ওপর— যার প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব চলছে মানুষের গোটা দেহের ওপর, দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ওপর, প্রতিটি রক্ত বিন্দুর ওপর, প্রতিটি স্পন্দনের ওপর, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর। সুতরাং সেই মহান সত্তারই আইন প্রয়োগ করতে হবে মানুষের কর্মজীবনের ওপর— সেটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ সেখানে ভিন্নতর কোনো

আইন সামঞ্জস্যশীল হতে পারেনা। আমি শ্বাস-প্রশ্বাস করব, খাওয়া দাওয়া করব, জীবনের প্রয়োজন পূরণ করব এবং শরীরকে বাঁচাব আল্লাহ্‌র আইন দ্বারা আর আমি দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে তাঁর আইন মানবনা? এটা হবে একটা অস্বাভাবিক জিনিস, একটা পরস্পর বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য নিয়ে মানুষের জীবন চলতে পারেনা— চলতে পারেনা মানুষের সমাজ। এই কারণে আল্লাহ্‌র আইন-বিধান মোতাবেক একটি রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। আমরা তাই এটাকে আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমরা চাচ্ছি আল্লাহ্‌র বিধান শুধু মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত ধর্ম হয়েই থাকবেনা, বরং আল্লাহ্‌র বিধান হবে মুসলিম সমাজের মুসলিম জাতির সামষ্টিক জীবন আদর্শ।

আমি বারবার বলে এসেছি, আদর্শ হিসেবে আমাদের কিছু একটা থাকা দরকার। সে আদর্শ এমন হতে হবে যে, তা একটা মূলনীতি থেকে আরম্ভ করে জীবনের সামগ্রীক দিককে পরিব্যাপ্ত করবে; জীবনের কোনো একটি দিককে সে বাদ দেবেনা। সেটাকেই বলা হয় আদর্শ— ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Ideology। তার ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে বাস্তব সকল চিন্তা-চেতনা, মানুষের কর্মময় জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন। আর তা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেনা। তাই রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ইসলামকেই আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যেন ইসলাম এ দেশে আইন-কানুন ও বিধি-বিধান হিসেবে অনুসৃত হয়— পালিত হয়। তার সাথে সাথে আর একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে; তা হচ্ছে, শুধুমাত্র আইন পালনের তাগিদই মানুষকে কখনো সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেনা। আইন পালনের তাগিদই যদি হয় কোনো আইন পালনের মূল কথা, তাহলে তা পালিত হবে কেবল তখন, যখন আইনের সংরক্ষকরা সামনে থাকবে। আর যখন তারা সামনে থাকবেনা, মানুষ তখন স্বাধীন হয়ে যাবে, নির্ভীক হয়ে যাবে; ফলে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা করতে শুরু করে দেবে, আইনকে অমান্য করতে শুরু করে দেবে। একারণেই মানব রচিত কোনো আইন বাস্তবিকভাবে সমাজে কার্যকর হতে দেখা যায় না। বর্তমান দুনিয়ায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে সেখানে আইন-কানুন আছে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রের জন্যে; কিন্তু সে আইন-কানুন পালিত হয় কেবল তখন যখন সে আইনের সংরক্ষকরা— আইনের কর্ম-কর্তারা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন সামনে থাকে, অর্থাৎ সে আইন পালিত হয় শুধু ভয়-ভীতির কারণে— স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নয়।

এরপর আসে মানুষের অধিকারের প্রশ্ন। কোনো অধিকার যদি মানুষকে আন্দোলন করে আদায় করতে হয় তাহলে তার মধ্যে থাকে চরম ফাঁকিবাজি— ধোঁকা-প্রতারণা; কখনও তা সঠিকভাবে পাওয়া যায়না। কারণ অধিকার যার কাছে চাওয়া হচ্ছে সে কোনোভাবেই তা দিতে ইচ্ছুক নয়। যদি সে অধিকার কারো কাছ থেকে বাধ্য করে আদায় করে নেয়া হয় তবে সে ন্যূনতম অধিকার দিয়ে কোনোভাবে রেহাই পেয়ে যেতে চেষ্টা করবে। তাই মানুষ এ ধরনের সমাজ থেকে কখনো শান্তি পেতে পারেনা। শান্তি তখনই মানুষের জীবনে আসতে পারে যখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে দেবে এবং সাথে সাথে নিজের অধিকারটাও পেয়ে যাবে; সে অধিকার নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব-কলহ, কোন আন্দোলন, কোনো সংগ্রামের প্রয়োজন হবেনা। দাবি আদায়ের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করার প্রয়োজন হবেনা, পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের সম্মুখীনও কাউকে হতে হবে না— দিতে হবেনা কারো বুকের তাজা রক্ত রাজ-পথে ঢেলে।

বস্তুত একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়ই মানুষ এ ধরণের অধিকার পেতে পারে এবং ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতিটি মানুষ তার নিজ ঘরে বসেই এ ধরনের অধিকার পেয়েছে। এমন কি পর্বত শৃঙ্গে বসে যে রাখাল ভেড়া চরাচ্ছিল সেও তার অধিকার সেখানে বসেই পেয়েছে। এ নিশ্চয়তা কেবলমাত্র ইসলামই দেয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোনো একটি লোকও তার এ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেনি।

এ ধরনের বিধি ব্যবস্থা না থাকার কারণে আমাদের সমাজে বিশৃঙ্খলা সর্বত্র বিরাজমান; কোথাও শান্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকেই শুধু নিজ নিজ অধিকার আদায় করে নিতে চাচ্ছে। অন্যের প্রতিও যে তার কোনো কর্তব্য আছে— আছে কোনো দায়িত্ব, সে কথা তারা ভুলে গেছে। কারখানা মালিক বেশি মুনাফা লাভের আশায় শ্রমিকদেরকে নির্মমভাবে খাটায়, তাদের ন্যায্য মজুরী বা অধিকার প্রদানের কথা মনে রাখতে চায়না; আবার কারখানার শ্রমিকরা তাদের পূর্ণ অধিকার পাওয়ার জন্যে আন্দোলন করে, সে জন্যে তারা ধর্মঘট করে, প্রয়োজনে তারা কারখানা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সে কারখানার প্রতিও যে তার কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য আছে, থাকতে পারে— সে কথা তারা প্রায়শ ভুলে বসে। এভাবে সমাজের সাধারণ লোক সম্পর্কেও বলা যায়, তারা

সরকারের কাছে নিত্য-নতুন দাবি-দাওয়া নিয়ে আর্জি পেশ করে, কিন্তু সরকারের প্রতিও তাদের একটা কর্তব্য আছে, সেটা পালন করতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। তাই এ ব্যবস্থাপনা দ্বারা সমাজের কোনো শান্তি আসতে পারে না।

আমরা মনে করি, মানুষের মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা কেবল তখনই আসতে পারে যদি ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে, পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত করা হয়। মানুষ যদি একে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে— কবুল করে নেয়, তাহলে এই যে মানুষে মানুষে পার্থক্য, ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্য, বড় আর ছোটর মধ্যে ব্যবধান— এসব কিছু থাকতে পারেনা। বরং খুব সহজেই একজনের সাথে অন্যজনের মিলন বা সখ্য গড়ে উঠতে পারে। সবার মাঝে গড়ে উঠতে পারে বন্ধুতা এবং প্রীতির সম্পর্ক। এ কাজটি আসলে আল্লাহ্ই করেন সত্যিকার অর্থে ঈমান গ্রহণকারী লোকদের মধ্যে।

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْ ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا -

তোমরা সকলে মিলিত হয়ে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে। আল্লাহ তখন তোমাদের মনকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিলেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩)

এখানে আল্লাহ্র রজ্জু অর্থ আল্লাহ্র প্রবর্তিত দ্বীন-ইসলাম। আর এই দ্বীন-ইসলামেরই যদি সকলে সত্যিকার অর্থে অনুসারী হয় তাহলে কারো সাথে কোনো বিবাদ-বিসংবাদ হতে পারেনা। 'ইতঃপূর্বে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ছিল, তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে'— এ কথাটি দ্বারা আল্লাহ্ বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তোমাদের মাঝে এই যে মিলন, এই যে বন্ধুতা— তা আসলে আমারই সৃষ্টি। এটা আমার তরফ থেকে তোমাদের প্রতি একটি বড় নেয়ামত; এটা আমার অনুগ্রহ আর এটা হয়েছে তোমাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে— ঈমানদার হবার কারণে।

আর একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ط لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

আর আল্লাহ্ই তাদের হৃদয়সমূহের মধ্যে বন্ধুতা-প্রীতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন। হে নবী! আপনি যদি দুনিয়ার সব কিছু ব্যয়ও করেন, তবু তাদের হৃদয়সমূহের মিল-সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সেই প্রীতি-বন্ধুতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বস্তুত তিনিই সর্বজয়ী— মহাশক্তিমান ও সুবিজ্ঞানী। (সূরা আন-ফাল ঃ ৬৩)

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ মুসলমানদের হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি-বন্ধুতা জাগিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের প্রতি, আল্লাহ্র নাযিল-করা বিধানের প্রতি, এ দ্বীনের প্রতি সকলের গভীর ঈমান গ্রহণের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এটা কোনো বস্তুগত সামগ্রী বা কোনো অর্থসম্পদ ব্যয়ের ফলে সম্ভব হয়নি। আল্লাহ না চাইলে দুনিয়ার সকল সম্পদ ব্যয় করেও নবী করীম (স) তা সৃষ্টি করতে পারতেন না।

এ দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি; তা হচ্ছে মানুষের মাঝে মানুষে, মানুষে এবং দেশে ও সমাজের বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা তখনই আসতে পারে যদি আল্লাহ্রই প্রবর্তিত আইন-কানুন সেখানে কায়েম থাকে অর্থাৎ একটি ইসলামী রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি ইসলামী রাষ্ট্রই পারে সমাজে বসবাসরত সকল নাগরিকের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে, সকল নাগরিকের সাথে বন্ধুতা সৃষ্টি করতে। মানুষ যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইনসাফের আকাঙ্ক্ষী হয় তবে তাদের উচিত একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা। একটি ইসলামী সমাজ যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে অনুযায়ী ব্যক্তি তার নিজকে গঠন করে, তার পরিবারকে গঠন করে, তাহলে সে সমাজের লোকেরাই পারে ইহকালীন জীবনের সাথে সাথে পরকালীন জীবনেও শান্তি লাভ করতে।

আল্লাহ্র শেখানো দো'আ ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

হে আমাদের রব্ব! আমাদের ইহকালীন কল্যাণ দান করো এবং সাথে সাথে পরকালীন কল্যাণও দান করো এবং দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইহকালীন হাসানা (কল্যাণ) পাওয়ার নসিহত করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন এবং সাথে সাথে পরকালীন হাসানা (কল্যাণ) পাওয়ার অর্থাৎ পরকালীন মঙ্গল চাওয়ারও নসিহত করেছেন। আর পরকালীন হাসানা ইহকালীন হাসানার ওপর নির্ভর করে। এখানে এই দো'আ অনুযায়ী ইহকালীন হাসানা বা কল্যাণ তখনই লাভ করা যেতে পারে যখন আমাদের দ্বারা ইসলামী জিন্দেগী যাপন করা সম্ভবপর হবে পুরোপুরিভাবে। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই পরকালীন হাসানা লাভ করা সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে। কেননা দুনিয়াতেই যদি আমরা হাসানা লাভ করতে না পারি কর্মময় জীবনে, তাহলে পরকালীন হাসানা পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তা'আলা এমনি যদি কল্যাণ দেন তাহলে তো ভিন্ন কথা— কারণ আল্লাহ্‌র দয়ার কোনো পরিসীমা নেই। কিন্তু আমাদের সাথে আল্লাহ্‌র যে মোয়ামেলাত তাঁর বান্দা হিসেবে, সেখানে কিন্তু শর্ত আছে; তাহলো আল্লাহ্‌র পূর্ণ বন্দেগীর মাধ্যমেই আমরা জান্নাত পেতে পারি। যেমন কুরআন মজীদে আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

আল্লাহ তা'আলা ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে।
(সূরা তওবা ঃ ১১১)

সুতরাং আমরা যদি আমাদের ধন-মাল, জীবন, মন-মানসিকতা সব কিছু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সোপর্দ করি— সোপর্দ করি নিজের সব কিছু, তবেই আমরা পরকালে জান্নাত পাব। আর তা নাহলে আল্লাহ্ জান্নাত দেবেন না বা আমরা তা পাব না।

এ কারণেই আমরা আমাদের জীবনটাকে অর্থহীন মনে করিনা। আমাদের এই জীবনটা নিতান্ত পশুর জীবন নয়— অর্থহীন জীবনও নয়। এটা মানুষের জীবন আর সেই মানুষের জীবন— যে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন— সম্মানিত করেছেন গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে। তাঁর এই ঘোষণা ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا -

আদম সন্তানকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করেছি। তাদেরকে স্থল ও জলপথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র জিনিস দ্বারা রিযিক দিয়েছি এবং আমাদের বহু সংখ্যক সৃষ্টির ওপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি। এ সকল আমারই একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ।

(সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ৭০)

এ একটা সুস্পষ্ট মহাসত্য যে, এই পৃথিবী এবং এর যাবতীয় জিনিসের ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য কোনো জ্বিন বা ফেরেশতা কিংবা আসমানের কোনো গ্রহ-নক্ষত্র দান করে নি কিংবা কোনো ওলী-বুযুর্গ অথবা মানুষ নিজে নিজে তার এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে নি। নিঃসন্দেহে এটা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌রই অবদান এবং একান্তভাবে তাঁরই অনুগ্রহ।

এরপর অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ -

তিনি ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের সমস্ত জিনিসকে তোমাদের জন্যে অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। এসব কিছুই তার নিজের পক্ষ থেকে।

(সূরা-জাসিয়াহ ঃ ১৩)

কোনো রাজা-বাদশা বা সরকার যেমন প্রজাদের নিকট থেকে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন প্রকার খাজনাপাতি আদায় করে, তা-ই আবার লোকদের মাঝে দান করে থাকে; আল্লাহ্‌র এই দান কিন্তু সে রকম কোনো দান নয়, বরং বিশ্বলোকের ও আকাশমণ্ডলের সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী ও নেয়ামতসমূহ আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি এবং তিনি নিজ থেকেই এ সব কিছু আমাদেরকে দান করেছেন, আমাদের অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন।

এই অনুগত এবং নিয়ন্ত্রিত করার কাজটি দুটি উপায়ে হতে পারে। একটি হলো ঐ জিনিসগুলোকে সরাসরি মানুষের অধীন ও অনুগত করে দেয়া এবং তাকে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার ও পরিচালনা করার ইখতিয়ার দান করা; সে যেমন চাইবে তেমনি ব্যবহার করতে পারবে এমনভাবে তার হাতে ছেড়ে দেয়া। আর

দ্বিতীয় হচ্ছে, ঐ জিনিসগুলোকে এমন এক নিয়ম ও আইনের অধীন বানিয়ে দেয়া যার কারণে জিনিসগুলো তার জন্যে উপকারী হবে এবং তার স্বার্থে কাজ করতে থাকবে। বস্তুত দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি জিনিসকেই যে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন তা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি। এ আলো, এ বাতাস, এ পানি, এ অবহাওয়া অর্থাৎ মানুষের জীবনের জন্যে যা কিছু দরকার— এসব কিছু আমরা প্রকৃতি থেকে পেয়ে যাচ্ছি।

সৃষ্টিলোকের সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী ও শক্তিসমূহের স্রষ্টা, মালিক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। সেই এক আল্লাহ্ই মানুষের রব্ব— প্রভু ও প্রতিপালক। তিনিই স্বীয় কুদরত, হিকমত ও রহমতের সাহায্যে এ সকল জিনিস ও শক্তিকে মানুষের জীবন-জীবিকা, আরাম-আয়েশ এবং উন্নতি-সমৃদ্ধির উপযোগী ও সাহায্যকারী বানিয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের কল্যাণ হতে পারে আল্লাহ্রই দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করলে। আর দুনিয়ার জীবনে যখন আমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা এত মেহেরবানি করেছেন তখন পরকালীন জীবনেও যাতে আমরা তাঁর মেহেরবানি পেতে পারি তার পুরোপুরি ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে ব্যবস্থা হতে পারে ইহকালীন জীবনে পুরোপুরি ইসলামী জীবন যাপনের মাধ্যমে— অন্য কোনোভাবে নয়।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, এই দুনিয়ায় আল্লাহ্র কুরআন এবং রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নত অনুযায়ী মানুষের জীবনকে পুনর্গঠিত করা। বর্তমানে আমাদের দেশে কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষের জীবন গঠিত নয়। ফলে দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবনে সব দিক দিয়ে ফ্যাসাদ, বিপর্যয়, ভাঙন, অশান্তি, হাঙ্গামা, মারামারি, কাটাকাটি— একটার পর একটা লেগেই আছে। এসব কিছু দেখে মনে হয়, এ জীবন যেন কোনো মানুষের জীবন নয়, বরং পশুর চাইতেও এক নিকৃষ্টতম জীবন। পশুদের জীবনেও হয়তো এতটা হানাহানি নেই যতটা আছে মানুষের জীবনে। সমাজের বুকে মানব জীবনের এই যে চরম দুরবস্থা— এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব যদি ইসলামকে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে বাস্তবায়িত করতে পারি। সে আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

এই যা কিছু আমরা করতে চাই, তা কেন করতে চাই? এর কারণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মানুষের জন্যে একটি সুষ্ঠু আদর্শের প্রয়োজন। কেননা কোনো সুষ্ঠু আদর্শ ছাড়া মানুষের জীবন চলতে পারে না। তার জন্য একটি চিন্তা-পদ্ধতি দরকার আর সে চিন্তা-পদ্ধতি হলো ইসলাম। কাজেই সে মত অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হলে ইসলামী জীবন বাস্তবায়িত হওয়া দরকার। এই ইসলামী জীবন বাস্তবায়িত করাই আমাদের জীবন লক্ষ্য। আর তা না হলে আমরা যথার্থ মুসলমান হতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে, মুমিন হিসেবে জীবন যাপন করারই নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً -

হে লোকেরা! তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও। (সূরা বাকারা ঃ ২০৮)

পুরোপুরিভাবে ইসলামে দাখিল হবার অর্থ হচ্ছে যে, তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান— তোমাদের মন-মস্তিষ্ক, তোমাদের চিন্তা-চেতনা, তোমাদের রীতি-নীতি, কাজ-কর্ম, তোমাদের লেন-দেন, তোমাদের চেষ্টা-সাধনা সব কিছুই যেন ইসলামের আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়। তোমরা জীবনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে ইসলামের কিছু অংশ মেনে নেবে আর বাকি অংশকে বাইরে রাখবে, এ নীতি কিছুতেই অবলম্বন করা যাবে না। ইসলামের বিধানসমূহ— তা মানব জীবনের যে-কোনো বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন— যে পর্যন্ত তার প্রতি পুরোপুরি ও সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত কিন্তু মুসলমান হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করা যাবেনা। মানুষের জীবনের কোনো একটি দিককে নির্দেশ করে বলা যাবেনা যে, এখানে আমি ইসলামের আওতার বাইরে; এখানে— এই স্থানে আমি আমার নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারি। তাই আল্লাহ্‌র নাযিল করা মূলনীতির ভিত্তিতে আমাদের তাঁর পূর্ণাঙ্গ বিধান মানতে হবে। এছাড়া মানুষের জীবন কল্যাণকর হতে পারেনা— সুখকর হতে পারেনা।

মানুষ স্বভাবতই তার জীবনে সুখ চায়, শান্তি চায়। নইলে তার এতো সংগ্রাম কিসের জন্যে? কেন এতো হাঙ্গামা করছে মানুষ। আসলে এই যা কিছু সে করছে সুখের জন্যেই করছে, শান্তির জন্যেই করছে। কিন্তু যে সুখের জন্যে এতো হন্যে

হয়ে ঘুরছে মানুষ সে সুখের সন্ধান সে কি পাচ্ছে? এক কথায় বলা যায়, সে সুখের সন্ধান সে পাচ্ছে না। কারণ যে পথে সুখ আসতে পারে সে পথ তো মানুষ ত্যাগ করেছে; সে পথকে মানুষ ভুলে গেছে— হারিয়ে ফেলেছে। সে পথের সন্ধান মানুষ জানে না বলে হয়তো সে বিভিন্নভাবে ভিন্নতর পথে সেই সুখের তালাশ করছে। তবে ভিন্ন পথে বা অন্যতর পথে মানুষের জীবনে সুখ আসবেনা— আসা সম্ভব নয়। দুনিয়ার কোথাও সেভাবে মানুষের জীবনে সুখ আসেনি। এ কথাটি সকলকে মেনে নিতে হবে।

এরপরে দেখা যাক, সুখ আমরা কাকে বলব আর সুখের সংজ্ঞাই বা কি? মোটামুটিভাবে এইটুকু বলা যায় যে, আমার যা কিছু প্রয়োজন, আমার জীবনের জন্যে যা যা প্রয়োজন তা আমি নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে পেয়ে যাব। এই যে আমার প্রয়োজনীয় বস্তুটির 'যথাযথভাবে নির্বিঘ্নে পেয়ে যাওয়া' কথাটি কিন্তু ব্যাপক। যেমন আমার পেয়ে যাওয়া, আমার প্রতিবেশীর পাওয়া এবং অন্যান্য লোকদের নিজ নিজ প্রয়োজন মতো সব কিছু পেয়ে যাওয়াই হচ্ছে সুখের মূল উৎস। এছাড়া রয়েছে মানুষের অধিকার— প্রতিটি মানুষের ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধান। এমন একটি নিশ্চিত ব্যবস্থা করা, যাতে কোনো একজন মানুষও তার প্রাপ্য অধিকার থেকে— তার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে না। এ রকম হবে না যে, দশজন মানুষ আছে, তার মধ্যে নয় জনের অধিকার হরণ করে নিয়ে একজন সব কিছু ভোগ করবে। এটা কিন্তু সুখ নয়, বাস্তবক্ষেত্রে সেখানে কোনো সুখ থাকেনা। এভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ বহু সংখ্যক মানুষের হক কেড়ে নিয়ে নিজের সুখ ভোগ করবে— সেখানেও কোনো শান্তি আসতে পারেনা। আসলে আমার প্রয়োজনের সাথে সাথে আমার প্রতিবেশী এবং আশে-পাশের মানুষ সকলেই যখন নিজ নিজ প্রয়োজনটা পেয়ে যাবে তখনই সুখ পাওয়া যাচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় সে ধরনের সুখ কোথাও নেই। ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, জাপানসহ দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য যত বড় বড় দেশ আছে, যে সকল দেশ সম্পর্কে আমরা মোটামুটি জানি সেসব দেশেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের সকল নাগরিক নিজেদের অধিকার সমানভাবে পাচ্ছেনা। অবশ্য তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা প্রয়োজনের অধিকও পাচ্ছে। এ ধরনের অব্যবস্থাই কিন্তু মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে, নিয়ে আসে চরম অশান্তি।

বস্তুত মানুষকে শান্তি দিতে হলে প্রথমে স্বীকার করে নিতে হবে তার মৌলিক অধিকারসমূহ আর সে জন্যে প্রয়োজন আইনের; কেননা আইন ছাড়া কোনো সমাজ চলতে পারেনা। এখন প্রশ্নে হচ্ছে, সমাজের জন্যে যে আইনটা দরকার সে আইনটা দেবে কে? এ সম্পর্কে বর্তমান সময়ের আইন বিশেষজ্ঞরা যে কথা বলেছেন তা হলো Comand of the Sovereign অর্থাৎ আইনত যে সার্বভৌম— তার আদেশ-নিষেধই হলো আইন। তা হলে আমাদের দেখা দরকার, এ সার্বভৌম কে? আমরা সার্বভৌম হিসেবে যদি দুনিয়ার কোনো মানুষকে স্বীকার করি তাহলে আল্লাহ্‌র বন্দেগীকে অস্বীকার করা হবে, এমনকি প্রকারান্তরে আল্লাহকেই অস্বীকার করা হবে। অথচ সারে জাহানের ওপর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সার্বভৌম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধই হচ্ছে মানুষের জন্যে আইন। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অর্থাৎ যা যা তিনি করতে বলেছেন তা আইন এবং যা যা করতে নিষেধ করেছেন, বিরত থাকতে বলেছেন, তাও আইন। কিন্তু আমরা আমাদের সমাজ জীবনে এর ব্যতিক্রমই দেখতে পাচ্ছি— দেখতে পাচ্ছি কোনো এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের তৈরী আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। মানুষ তার নিজের জন্যে তার সমাজের জন্যে ইচ্ছামত আইন তৈরি করে নিচ্ছে। কোথাও কোথাও ব্যক্তি বিশেষ ডিক্টেটর হয়ে বসে নিজ ইচ্ছামত দেশ পরিচালনা করছে। এই এক ব্যক্তির ইচ্ছামত কাজ করার ফলে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসছে।[১]

আমাদের দেশেও বহুদিন ধরে এ ধরনের কর্মকাণ্ড চলে আসছে। সত্তর আশির দশকে আমরা উপর্যুপরি কয়েক ব্যক্তিকে সার্বভৌম হয়ে ক্ষমতায় বসতে দেখেছি। যারা ছিল আমাদের মতোই মানুষ, আমাদের মতই পিতা-মাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করা এবং আমাদের মতোই খেয়ে-পরে বড় হওয়া। তাদের এমন কোনো যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্য ছিলনা যার দ্বারা সে আমাদের ওপরে এ মর্যাদার অধিকারি হতে পারে— আমাদের ওপর উঠে তাদের কর্তৃত্ব চালাতে পারে। তারা হুকুম করবে; হুকুম চালাবে আর আমরা তা পালন করতে বাধ্য থাকব— কিন্তু কেন? কেন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্যে আইন বানাবে? কোন অধিকারে? কোন দিক

১. কোথাও কোথও গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তি-বিশেষ পরোক্ষ ডিক্টেটরী বা একনায়কত্ব চালাচ্ছে, যা একইভাবে গণমানুষকে স্বেচ্ছাচারিতার যুপকাষ্টে বলি দিচ্ছে, মানুষের জীবনকে জুলুম নির্যাতনে ভরে তুলছে। —সম্পাদক

দিয়ে তারা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে বসেছিল? নিশ্চয়ই সার্বভৌমত্ব বা ক্ষমতার জোরে। তাইতো দেখা যায় বর্তমান দুনিয়ায় মানুষের ওপর চলছে মানুষের কর্তৃত্ব। এভাবে মানুষ রূপী প্রভুরা হরণ করে নিচ্ছে গণ-মানুষের জন্মগত অধিকারটুকু। আর এখন তো গণতন্ত্রের নামেই আর একটি প্রহসন চলছে সারা দুনিয়ায়। গণতন্ত্র মানেই যেন মুক্তি, গণতন্ত্র থাকলেই যেন মনে করা হয় সব কিছু ঠিক-ঠাক চলছে আর গণতন্ত্র না থাকাটাই যেন একটি বড় অপরাধ। তাহলে দেখা যাক গণতন্ত্র বলতে আসলে কি বুঝায়? গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাই বা কি। বলা হয় যেখানে গণতন্ত্র থাকে না সেখানে থাকে স্বৈরতন্ত্র। তাহলে দেখা যাক স্বৈরতন্ত্রই বা কি জিনিস?

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কিছুর আদেশ বা নিষেধ করে আর তা যদি মানুষকে মানতে বাধ্য করানো হয়, তবে তা হয় স্বৈরতন্ত্র। এক ব্যক্তির কর্তৃত্ব বা আদেশ নিষেধ মানুষ হয়তো সহজে মানবে না বা স্বীকার করবে না। তারা এর যৌক্তিকতা, এর সার্থকতা খুঁজে বেড়াবে। সে জন্যে তারা এর দর্শন বের করল যে, এক ব্যক্তি নয় দেশবাসী নিজেরাই নিজেদেরকে শাসন করবে আর কিভাবে শাসন করবে তারও একটা প্রক্রিয়া তারা বের করল। সেটা হলো যে, প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণ নিজেদের প্রতিনিধি বাছাই করবে এবং সে প্রতিনিধিরা একত্রে বসে যে আইন তৈরি করবে সে আইনই হবে জনগণের পক্ষ থেকে প্রণীত আইন; সে আইন সকলকে মানতে হবে। এটার নাম দেয়া হলো 'গণতন্ত্র'— অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা আর মর্জির নাম দেয়া হলো 'গণতন্ত্র'।

কিন্তু আমরা তো মুসলমান, আমাদের মুসলমান হিসেবে ওখানে চাওয়া-পাওয়ার কি থাকতে পারে? কেননা আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি যে ধরনের ঈমান বা বিশ্বাস রাখি, সেখানে আইনদাতা বা বিধানদাতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। আর গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে মানুষের তৈরি আইন। এখানে আল্লাহ্‌কে, আল্লাহ্‌র কুরআনকে, রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাহকে স্বীকার করা হয়নি। যেখানে আমাদের উপাস্য আল্লাহ্‌কে এবং আমাদের প্রিয় নেতা রাসূল (স)-কে স্বীকার করা হয়নি সেখানে আমরা যাই কী করে— সে তন্ত্র-মন্ত্র আমরা মুসলমান হিসেবে মানি কী করে ? প্রশ্ন স্বভাবতই থেকে যায়।

সাধারণভাবে জনগণকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয় যে, এক ব্যক্তি দেশ শাসন করবে— তার চাইতে দেশবাসী নিজেরাই নিজেদের শাসন করবে,

তুলনামূলকভাবে এটা খারাপ নয়— মোটামুটি মন্দও নয়। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকাসহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র বাংলাদেশেও। যে দিকেই তাকাইনা কেন সর্বত্রই একই রকম, একই রূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে— তা হচ্ছে এক ব্যক্তির শাসন। এক ব্যক্তির হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব নেতৃত্ব এবং সে ব্যক্তির হুকুম মানাই হচ্ছে গণতন্ত্র আর না মানাটাই হচ্ছে বড় অপরাধ— অগণতান্ত্রিক আচরণ। তাই বলা চলে, গণতন্ত্রের বুলি একটা ধোঁকা আর প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললেই নয়। তা হচ্ছে, জনগণ যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নিজেদের ইচ্ছামত কোনো আস্থাভাজন ব্যক্তিকে সমর্থন করতে পারত এবং সে ব্যক্তি যদি অধিক সংখ্যক লোকের আস্থাভাজন হয়ে নির্বাচিত হতে পারত, তা হলেও না হয় ধরে নেয়া যেত যে, সে ব্যক্তি জনগণের প্রতিনিধি। কিন্তু এখানে তো তা হচ্ছে না; শুধু এদেশের কথাই বা বলছি কেন, কোনো দেশেই তা হচ্ছে না। পৃথিবীর যেখানেই, যে দেশেই ভোটাভুটি হচ্ছে, সেখানে কোনো-না কোনোভাবে জনমতকে বিভ্রান্ত করার কলাকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে; নানাভাবে জনগণকে প্রভাবিত করা হচ্ছে— বিভিন্ন ধরনের ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। ভোটের সময় জনগণের সামনে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার করা হয়, তাদেরকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, বিশেষ প্রার্থীকে ভোট না দিলে জনগণের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এভাবে জনগণকে প্রতারণার জালে ফেলে কূট-কৌশলে তাদের কাছ থেকে ভোট নামক বস্তুটি— বলতে গেলে একরকম ছিনিয়েই নেয়া হয়। আবার কোথাও কোথাও ভোট নেয়ার জন্য চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে জনগণ বা ভোটার— তাদের রায় সঠিকভাবে জানাতে পারেনা। এসব কিছুই আপনাদের জানা; বিশেষ করে আমাদের এ দেশে, প্রতিবেশী ভারতে এবং পাকিস্তানে— এ উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রের সর্বত্রই গণতন্ত্র নামক এই সিসটেমের চরম দুর্গতি আমরা লক্ষ্য করছি।[১]

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত একটি বিশাল দেশ। ১৯৪৭ সালের পর থেকে সেখানে নিয়মিত নির্বাচন হয়ে আসছে। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন সে

১. এমন কি গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য বলে খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থাও খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। সে দেশের সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে ফ্লোরিডা রাজ্যের ভোট গণনা নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয়ে গেল, তা তৃতীয় বিশ্বের ভোট কেলেঙ্কারীকেও বহুলাংশে হার মানিয়ে দিয়েছে। —সম্পাদক

নির্বাচনগুলি কিভাবে হচ্ছে। বড় বড় টাকাওয়ালারা গরীব ও অশিক্ষিত লোকদের ভোট টাকা দিয়ে কিনে নেয়। তাদেরকে নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখানো হয় কিংবা তাদের মনতুষ্টি সাধন করে ভোট বাগিয়ে নিয়ে তবেই প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়। সে দেশে এমন কোনোন নির্বাচন হয়নি যেখানে গণতন্ত্রের নামে বহু লোককে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, ভোট বাক্স ছিনতাই এসব সেখানে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর পাকিস্তানে যে সব নির্বাচন হয়ে আসছে তাতে প্রায় একই অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জিয়াউল হক সাহেবের আমলে তিনিই একমাত্র প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু যে খবর আমরা পেয়েছি তাতে সেখানে ভোট দিতে শতকরা ১০/১২ জনের অধিক লোক ভোট কেন্দ্রে যায়নি। অথচ সেখানে বিপুল সংখ্যক লোক ভোট দিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় দুনিয়ার মানুষকে জানান হলো কতো বিপুল সংখ্যক লোক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। আসল ব্যাপার কিন্তু ভিন্ন।

এরপর আমাদের দেশেও যেসব নির্বাচন হয়ে আসছে তাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এক ব্যক্তি ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে বসে ক্ষমতার দাপট চালিয়ে গেছেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, সামরিক বাহিনীর প্রধান। ক্ষমতায় বসে তিনি রাজনৈতিক দলও বানিয়ে ফেলেন এবং তার প্রতি যারা আনুগত্য প্রকাশ করেছিল তাদেরকে দিয়ে তিনি তার ক্যানভাসার বানিয়ে মাঠে নামিয়ে দেন। কাজেই এই নির্বাচনে তার দলকে বিজয়ী করার জন্যে সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। এরপর আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য যে সব দল এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্যে প্রচার অভিযান চালাচ্ছিল, সে সব দলের প্রার্থীদের ওপর তার ক্যানভাসাররা তলোয়ার ও রামদা নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়েছে; যার পরিণামে ৫০/৬০ জন নিহত হয়। আরো বহু লোকের জীবনের বিনিময়ে এভাবে তার দলের বিজয়কে নিশ্চিত করার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হয়।[১]

এই যে সাধারণ মানুষকে জীবন দিতে হয় তা কিসের জন্যে? মানব জীবনের কি কোনো মূল্য নেই? তা কি একেবারেই মূল্যহীন! কোনো এক ব্যক্তি দলের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্যে কিংবা কোনো কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন

১. এ হলো ১৯৮৬ সন পর্যন্ত নির্বাচনের অবস্থা। এর পরবর্তী ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সনের নির্বাচনেও এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। —সম্পাদক

বানাবার জন্যেই তো এ মানুষগুলোকে মরতে হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ সকল নির্বাচন হচ্ছে ক্ষমতা দখলের নির্বাচন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে আমাকে ক্ষমতায় যেতে হবে, তাতে যা কিছু করার প্রয়োজন তা আমাকে করতে হবে— সকল প্রার্থীই এ ধরনের মনোভাব নিয়ে এসব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে। এভাবে এক উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় মানুষ মেতে ওঠে। অর্থাৎ নির্বাচিত হবার জন্যে যে যতো পারো কারচুপী করতে পারো, কারসাজি করতে পারো, ষড়যন্ত্র করতে পারো, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারো— এমন কি প্রয়োজন হলে মানুষ খুন করতে পারো, যে খুনের কোনো বিচার নেই। এছাড়া ভোটারদেরকে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা কিংবা প্রয়োজনে ভোট কেন্দ্রে যেতে না দেয়া ইত্যাদি ধরনের উপায়-উপকরণও অবলম্বন করা হয়। আর এরই নাম হলো নির্বাচন— নিরপেক্ষ নির্বাচন। আর এরই নাম হলো গণতন্ত্র।

এ ধরনের তৎপরতার এক বিরাট প্রভাব পড়ে সাধারণ ভোটারদের ওপর। তাই সহজে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যেতে তাদের অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেনা। কেউ কেউ মনে করে যে, ভোট কেন্দ্রে যাবার পূর্বেই হয়তো ভোটটি দেয়া হয়ে গেছে। এসব কারণে ইদানীং লোকদের মধ্যে ভোটের ব্যাপারে একটা বিতৃষ্ণা— একটা অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়। এটি হয়েছে খুবই স্বাভাবিক কারণে; গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে গণতন্ত্রের লেবাসধারীরা যে কর্মকাণ্ড ঘটায় এটা তারই কুফল।

আপনারা জানেন, গণতন্ত্র একটা সেকুলার মতাদর্শ। এটি ইহুদী-খ্রিস্টানদের তৈরী এবং বৃটিশদের দ্বারা লালিত-পালিত-প্রচারিত। এখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে স্বীকার করা হয় না— স্বীকার করা হয়না কুরআনকে সংবিধান হিসেবে, আল্লাহ্র দেয়া আইন হিসেবে। এখানে জনমতের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করা হয়। আর জনমতের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করতে হলে জনমতের যিনি প্রতিফলন ঘটাতে পারবেন তারই মত এখানে কার্যকর করা হয়। এরই ফলে মানুষ ব্যক্তির প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। ব্যক্তিদের তৈরি করা আইন পালন করতে মানুষ বাধ্য হয়। অথচ কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টিকে মানুষের জন্যে কোনো মৌল আইন তৈরি করার অধিকার দেয়াটা সম্পূর্ণ শিরক— একেবারেই নাজায়েয। এর চেয়ে বড় পাপ আর কিছুই হতে পারেনা। যে অধিকার আল্লাহ্র সে অধিকার তারই সৃষ্টি কোনো বান্দাকে দিয়ে দেয়ার মতো

ধৃষ্টতা আর কিছু হতে পারেনা। অথচ এ ধরনের ধৃষ্টতা বা অমার্জনীয় অপরাধ আমরা করে যাচ্ছি অহরহ— এমনকি তার চেতনা পর্যন্ত আমাদের নেই।

এরপর আমরা আরও দেখতে পাই, যে সমস্ত লোক ভোট বাক্স ছিনতাই করে, মানুষ হত্যা করে, টাকা দিয়ে ভোট ক্রয় করে এবং জনগণকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসেন, তারাই পরে সমাজের জন্যে, দেশের জন্যে আইন তৈরি করার অধিকার লাভ করেন। তারাই পার্লামেন্টে বসে যে আইন তৈরি করে সবাইকে তা-ই মানতে হয়। প্রশ্ন হলো, যারা বড় বড় ক্রাইম করে পার্লামেন্টে আসে তারা দেশ ও জাতির জন্যে কি আইন উপহার দেবে? এর চেয়ে বড় কলঙ্ক দেশ ও জাতির জন্যে আর কি হতে পারে? অথচ দীর্ঘ দিন ধরে এসবই হয়ে আসছে আর জনগণ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়, এটা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা দরকার, যারা পার্লামেন্টে বসে আইন তৈরী করেন, তারা কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। তারা অনেক বড় লোক, উচ্চ শ্রেণীর লোক, টাকাওয়ালা লোক; নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য তাদের আছে; অর্থাৎ সমাজের যারা বিত্তবান ও প্রভাবশালী, তারাই সংসদে গিয়ে বসেন। অন্যদিকে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই গরীব এবং অতি সাধারণ। তাদের দুঃখ-কষ্ট বোঝার মতো মন-মানসিকতা এঁদের কোথায়? তাইতো দেখা যায়, পার্লামেন্টে বসে এঁরা যখন বিভিন্ন জিনিসের ওপর নতুন করে ট্যাক্স বা কর আরোপ করেন তখন এদেশের জনগণের ওপর যেন এক ধরনের নির্যাতন চালানো হয়; জনগণকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে দেয়া হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ বলতে গেলে যে দিশেহারা হয়ে যায়— তা বোঝার মতো মন-মানসিকতা বা অনুভূতি এদের কোথায়? কর আরোপ করার সময় এরা ভেবে দেখেনা যে, আমরা যা করছি তার বোঝা এ দেশের গরীব জনগণ কতটা বহন করতে পারবে।

এরপর বলতে হয়, পার্লামেন্ট সদস্যরাও তো রক্ত-মাংসের মানুষ। এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যেই স্বার্থ-বুদ্ধি থাকা স্বাভাবিক। এদেরও তা-ই আছে; স্বার্থের ঊর্ধ্বে তারা নয়। নিজের সুবিধা বা দলের সুবিধা ত্যাগ করা বা তার ঊর্ধ্বে ওঠা এদের পক্ষে সম্ভব নয়— এটা অতি সাধারণ কথা। এহেন মানুষের ওপর যদি আইন বানানোর পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়, তুমি ফয়সালা করো, আইন তৈরি

করো— তোমার ফয়সালাই হবে চূড়ান্ত, তাহলে সে এমনই আইন তৈরি করবে যার মধ্যে নিজের ব্যক্তি-স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ নিহিত থাকবে। কেননা পার্লামেন্টে বসে তারা এমন আইন নিশ্চয়ই তৈরি করবে না যার ফলে ভবিষ্যতে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ আর থাকবে না; বরং তারা এমন আইন তৈরি করবে এবং এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবে যেন তাদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সহজে কেউ তাদেরকে সরিয়ে দেবে এমন কোনো পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করবে না। কথায় বলে, জোর যার মুল্লুক তার। ক্ষমতা তাদের হাতে— যা খুশি তা করতে বাধা কোথায় ?

বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, দেশ স্বাধীন হবার পর সর্বপ্রথম যারা ক্ষমতায় এলো তারা বোঝাতে চাইলে যে, আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেয়েছি। অর্থাৎ চিরদিনের জন্যে আমরা ক্ষমতায় এসেছি; আমাদের হটাতে পারে এমন কেউ নেই। তারপর যারা এলো তারা দাবি করল, আমাদের মোকাবেলায় দাঁড়াবার মতো দ্বিতীয় কেউ নেই; আমরাই সবার সেরা। এধরনের মনোভাব নিয়ে তারা পার্লামেন্টে খেয়াল-খুশী মতো আইন পাশ করে চলল। কিন্তু যারা এধরনের কাজ করেছিল তাদের কেউই বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারলনা। প্রকৃতির নিয়মেই তারা অচিরেই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেল। তাদের জায়গায় অন্য এক শক্তির অভ্যুদয় ঘটলো। তার পরে যিনি ক্ষমতায় এলেন তিনি বললেন, "আমাদের সামনে দাঁড়াবার মতো কোনো শক্তিই আর বাংলাদেশে নেই। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলেন না। এভাবে বিগত বছরগুলোতে রাজনীতির নামে চলছে স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতা লিপ্সু ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতা। এ স্বেচ্ছাচারিতার শিকার এদেশের নিরীহ জন-মানুষ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামে বিশ্বে যে জীবনধারা চলছে, সে জীবনধারা সেকুলার জীবনধারা। সেকুলার জীবনধারা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার জীবনধারা। এ জীবনধারায় মানুষের জীবনে কখনও শান্তি আসতে পারেনা। এতে ব্যক্তি চরিত্রে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়; ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়, সামাজিক ক্ষেত্রে অসঙ্গতি দেখা দেয়, পারিবারিক জীবনে ভাঙন দেখা দেয় এবং অর্থনৈতিক জীবনে মানুষকে শোষণ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। এর থেকে রক্ষা পাওয়া মানুষের জন্যেই জরুরী।

তাই আমরা বিশ্বাস করি, এদেশে দুনিয়ার অন্য কোনো বিধান নয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বিধান বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। কেবল তা হলেই মানুষ ঐ সকল শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ পাবে। এ নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে, অন্য কোনো বিধান বা কোনো তন্ত্র-মন্ত্র নয়।

পাশ্চাত্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে সে ব্যবস্থা দুনিয়ায় শোষণমূলক পুঁজিবাদ সৃষ্টি করেছে। এ গণতন্ত্র হলো রাজনৈতিক গণতন্ত্র আর রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ হলো পুঁজিবাদ। এখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাচারিতা চলতে থাকে অনিবার্যভাবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হয় কিছু লোকের হাতে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রথমে কিছু লোক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়; তারপর তাদের মধ্য থেকে আবার একজনকে উচ্চতর ক্ষমতার মালিক বানানো হয়। বাহ্যত দেখা যাবে, সেখানে হয়তো একটি পার্লামেন্ট কিংবা একটি কংগ্রেসও আছে বা একটি হাউজ অব কমন্সও আছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় শীর্ষ নেতার কাছে। আর একজন নেতার কাছে যখন সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় তখন সদস্যরা ঐ নেতারই মর্জিমত কাজ করতে বাধ্য হয়। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তীতে নেতার সকল কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে তার সঙ্গেই থাকতে হয়। তার কাজ সঠিক হোক কিংবা বেঠিক হোক সে চিন্তা করার তাদের আর কোনো সুযোগ থাকেনা। ক্ষমতার কোনো একটি অংশের দাবিদার হতে হলে নেতার মর্জির বাইরে যাওয়া যায়না। ফলে কোনো না-কোনোভাবে এক ব্যক্তির কর্তৃত্ব সকল মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। মানুষ আর এ থেকে রেহাই পায়না। ৪ বছর কিংবা ৫ বছরের জন্যে এ কর্তৃত্ব মানুষের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে, যা থেকে রেহাই পাওয়া একরকম দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশে দেখা যায় যে, কোনো মতে কোনো দল বা ব্যক্তি যদি একবার ক্ষমতায় যেতে পারে তবে সেখান থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়া কিংবা তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও সহজভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের নজির বলতে গেলে নেই। আর একটি ব্যাপার হলো ঃ যে জনতার ভোট নিয়ে তারা ক্ষমতার শিখরে আরোহন করে বা ক্ষমতাসীন হবার সুযোগ পায় সে জনতাকেই আবার

নির্যাতন-নিষ্পেষণ চালিয়ে জর্জরিত করা হয়। যে জনগণের হাতে তারা চাঁদ তুলে দেবে বলে একদিন ওয়াদা করেছিল— অঙ্গীকার করেছিল সুখী-সমৃদ্ধশালী করে তুলবে তাদের জীবন, সে জনগণের হাতে পরবর্তী কালে ছাই তুলে দিতেও তাদের লজ্জা হয় না। ক্ষমতায় বসে তারা ভুলে যায় তাদের সমস্ত ওয়াদা আর অঙ্গীকারের কথা। ফলে জনগণকে তারা আর চিনতে পারেনা। একেই বলা হয় স্বৈরতন্ত্র— এভাবেই সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক পন্থায় স্বৈরতন্ত্রের শাহী মসনদ।

১৯৭৫ সনে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাকশাল গঠন করেন তখন ঘোষণা করা হলো, দেশে মাত্র একটি দল থাকবে অর্থাৎ বাকশাল। সে দলের চেয়ারম্যান তিনি, দেশের প্রেসিডেন্টও তিনি আবার রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসও তিনি; এ ছাড়া সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল তারই হাতে। তার মানে তিনিই সব আর কেউ কিছু নয়। এই যে ক্ষমতার এক কেন্দ্রিকতা এটাই মানুষের জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে সামগ্রীক বিপর্যয়ও নেমে এসেছে। ফলে তার সাথে আরও অনেককে এর জন্যে মূল্য দিতে হয়েছে। কাজেই ক্ষমতার এই এক কেন্দ্রিকতা এবং এর কুফল সম্পর্কে আমাদের সকলের সতর্ক থাকা উচিত।

এরপর জিয়াউর রহমানের আমলে কিছুটা পরিবর্তন ঘটল— সেটা কি? সেটা হল বহু দল— বহু পার্টি; যে যত পার দল গঠন করো এবং তা সরকারের অনুমতি নিয়ে। ফলে রাতারাতি বহু দল গজিয়ে উঠল। প্রায় ৬০ থেকে ৬৫টির মতো রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়েছিল সরকারের অনুমতি নিয়ে; কিন্তু ব্যবস্থাটা তা-ই ছিল যা শেখ মুজিবের আমলে ছিল। অর্থাৎ যিনি প্রেসিডেন্ট তার হাতেই অসীম ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাই ভোগ করেছেন জিয়াউর রহমান। তারও একটা দল ছিল, যে দল পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে এসেছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদসহ একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন এবং তাদের মাধ্যমেই আইন-কানুন পাশ করানো হতো। আর আইন-কানুন যা কিছু বানানো হতো বা পাশ করানো হতো তা সব কিছুই হতো জিয়াউর রহমানের খেয়ালখুশি মতো। ফলে দেখা গেল, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারই কর্তৃত্ব, পার্লামেন্টে তারই কর্তৃত্ব এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবেও তারই কর্তৃত্ব। এখানেও সেই একই ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মানুষের কর্তৃত্ব মানুষ মেনে চলবে, এর চেয়ে চরম লাঞ্ছনার বিষয় আর কি হতে পারে? মানুষের কর্তৃত্ব মানবে বনের পশুরা; কেননা পশুকে মানুষ ব্যবহার

করে তার নিজের কাজের জন্যে। তাই বলতে চাই, মানুষ আর মানুষের কর্তৃত্ব মানবেনা; মানুষকে মানুষের গোলামীর জন্যে তৈরী করা হয়নি— তাকে আল্লাহ্‌র কাজের জন্যে ব্যবহার করতে হবে আর সেখানেই হচ্ছে মানুষের মর্যাদা। কেননা মানুষকে নিজের ইচ্ছামত অন্য কোনো মানুষ ব্যবহার করবে এ অধিকার কারো থাকতে পারেনা। কেউ কোনো আদেশ-নিষেধ পালন করতে কাউকে বাধ্য করতে পারে, এ ধরনের অধিকারও কারো থাকতে পারেনা। এ অধিকার আছে এবং থাকতে পারে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার— অন্য কারোর নয়।

এ হিসেবে দেখা যায় যে, আমরা আল্লাহ্‌র বান্দাহ্, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্দেগী করছি মানুষের। আমাদের বাস্তব জীবন দিয়ে, জীবনের সমস্ত কাজকর্ম দিয়ে সে বন্দেগী করছি। এর মতো লজ্জা আর অপমানের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। এ কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি আমাদের একান্তই প্রয়োজন। এ মুক্তি আসতে পারে কেবলমাত্র ইসলামের মাধ্যমে, ইসলামী জীবন আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে— অন্য কোনোভাবে নয়। আমরা ইসলামকে বাস্তবায়িত করতে চাই জীবনে ও সমাজে; তার কারণ হিসেবে বলতে পারি, ইসলামই মানুষকে যথার্থ মর্যাদা দেয় আর সকল মানুষ সমান মর্যাদা সম্পন্ন। একমাত্র ইসলামই এই ধারণা দেয় যে, দুনিয়ায় যতো মানুষ আছে তারা সকলেই এক আদম ও হাওয়ার সন্তান। সকলে একই বংশজাত, প্রত্যেকের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত। ভৌগলিক কারণে বর্ণে পার্থক্য হতে পারে, ভাষার পার্থক্য হতে পারে, আকার-আকৃতিতে পার্থক্য হতে পারে। এছাড়া মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই, নেই কোনো ভেদাভেদ, থাকতে পারে না। মানুষে মানুষে এই যে সাম্য, এ সাম্যের কথা একমাত্র ইসলামই বলে আসছে সৃষ্টির সূচনা থেকে।

আমাদের দেশে যখন কমিউনিজম আসে তখন এটাকে সাম্যবাদ নাম দিয়ে প্রচার করা হয়; বলা হয়— ধনী আর গরীব সকলেই সমান। আসলেই কি তা কোথাও হয়েছে? মোটেই না। এসব নেহাত ধোঁকা আর প্রতারণার বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা কমিউনিজমের বাস্তব রূপ যদি কোথাও থাকে তো তা রয়েছে চিন ও রাশিয়া।[১] সে চিন-রশিয়ায়ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সকল মানুষ

১. উল্লেখ্য যে, এই বক্তব্য প্রদানের সময় রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসন পুরোদস্তুর কায়েম ছিল। —সম্পাদক

সমান নয়। সেখানে শ্রমিকের মধ্যে বেতনের পার্থক্য রয়েছে। প্রশাসনের নিম্নপদস্থ কর্মচারী আর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যিনি, তিনি আবার রাজনৈতিক ক্ষমতারও উৎস— অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎসও সেই একই ব্যক্তি। কেননা দেশের যত জমি আছে, যত ক্ষেত-খামার আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, উৎপাদন উপায় তথা কল-কারখানা আছে, কোনো কিছুর মালিকই কোনো ব্যক্তি নয়; বা কোনো প্রাইভেট কোম্পানী নয় বরং এ সব কিছুরই মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র। আর রাষ্টের ওপর কর্তৃত্ব চলছে, হুকুম চলছে, সেই সর্বোচ্চ ব্যক্তিরই। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সর্বোচ্চ ব্যক্তি যিনি, রাজনৈতিক দিক দিয়েও সর্বোচ্চ মালিক তিনিই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঠিক তা-ই হচ্ছে যা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। এর মধ্যে মৌলিকভাবে কোনো পার্থক্য নেই। ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত পার্থক্য হয়তো কোথাও কোথাও রয়েছে; কিন্তু সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ মানুষের গোলাম হয়ে আছে। একজন মানুষ তারই মতো আর একজন মানুষকে নিজের গোলাম হিসেবে ব্যবহার করছে। এ ধরনের অধিকার কারো আছে বা থাকতে পারে বলে আমরা স্বীকার করিনা। আল্লাহ ছাড়া আর কারোর এ অধিকার থাকতে পারেনা— নেই। অতএব এ ধরনের মানবীয় গোলামী থেকে মুক্তির একটি মাত্র পথ আছে— অন্য সব গোলামীকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র গোলামীকে স্বীকার করে নেয়া। আমরা যে কালেমা পড়ি لا اله الا الله محمد رسول الله। তাতে মূলত একথাই বলি। যেমন ঃ

বস্তুত লা-ইলাহা বলে আমরা সব কিছুকে অস্বীকার করি এবং ইল্লাল্লাহু বলে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করি। এটাই হলো কুরআনের মূল কথা। কুরআন যে জীবন দর্শন পেশ করে, তার মূল কথা হলো এই ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ -

তোমরা তাগূতী শক্তিকে অস্বীকার করো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো।

(সূরা বাকারা ঃ ২৫৬)

এখানে তাগূত অর্থ প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা

অগ্রাহ্যকারী শক্তি। অর্থাৎ "সে বান্দাকেও তাগূত বলা হবে যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা লংঘন করে নিজেই প্রকারান্তরে নিজের প্রভু বা মনিব হবার ভান করে এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগীকে বাদ দিয়ে নিজের বন্দেগী করতে অর্থাৎ নিজের হুকুম মানতে বাধ্য করে।" "কাজেই যে শক্তি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র বান্দা না বানিয়ে নিজের বান্দা বা অন্য কারোর বান্দা বানাতে চায়— গোলাম বানাতে চায়, এই সকল তাগূতকে উৎখাত ও অস্বীকার করতে হবে।" এ ছাড়া আমাদের খুব কাছের যে তাগূত রয়েছে সে হচ্ছে শয়তান, যে অনবরত আমাদের পিছু লেগে আছে; যার কাজ নিত্য-নতুন লোভ-লালসা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়া। এ ছাড়া আরও যে সব তাগূত আমাদের কাছাকাছি থেকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এবং যাদের ছাড়া আমরা বসবাস করতে পারিনা, চলাফেরা করতে পারি না, এদের মধ্যে রয়েছে স্ত্রী-পুত্র, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ ও সমষ্টি, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব, রাষ্ট্র-সরকার, প্রশাসন কর্মকর্তা— এরা প্রত্যেকেই লোকদের দ্বারা নিজেদের দাসত্ব করিয়ে নিয়ে থাকে। কাজেই এর কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা যাবেনা।

আলোচনার উপসংহারে আমরা মানুষকে সমস্ত গোলামী ছিন্নকারী একমাত্র আল্লাহ্‌র দাস বা গোলাম হয়ে জীবন যাপন করার আহ্বান জানাই তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে। পরকালে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাজাতের সুযোগ গ্রহণ করার এটাই একমাত্র পথ।

এ দ্বীনের দাওয়াতই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের (স) মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরাও সে দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ঘুমিয়ে থাকা চেতনাকে জাগাতে চাই। আসুন, সমাজের বুকে মানুষের ওপরে যে সকল অবৈধ প্রভুত্ব কর্তৃত্ব মানুষকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে, সে সকল প্রভুত্বকে অস্বীকার করি এবং শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র গোলামীতে নিজেদেরকে শামিল করে মানুষ হিসেবে আমরা যে আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি সেটা প্রমাণ করি।

এই যে মহান লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে চাই তার জন্যে প্রয়োজন একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রীয় শক্তির। সে রাষ্ট্র-শক্তি পেতে হলে দরকার একটি ইসলামী গণবিপ্লবের। আমাদের জীবনের লক্ষ্যও তা-ই। অর্থাৎ এদেশে একটি

ইসলামী গণবিপ্লবের মাধ্যমে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। সে বিপ্লবের সঙ্গী হিসেবে, সাথী হিসেবে আপনাদেরকে আমরা পেতে চাই। আজ সে বিপ্লবের দাওয়াতই আমরা আপনাদেরকে দিয়ে গেলাম। আল্লাহ সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার তওফীক দিন। আমিন।।

বাণী চিরন্তন

আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা একটি বড় ইবাদত আর সে ইবাদত আল্লাহ প্রবর্তিত পন্থা ছাড়া হতে পারে না।

ইসলামকে এদেশের মানুষ ধর্ম হিসেবেই ব্যবহার করে আসছে কিন্তু দ্বীন হিসেবে ইসলাম এখানে স্বীকৃতি পায় নি।

কোন মানুষকে তার জন্য আইন তৈরী করার অধিকার দিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ শিরক। এটা জায়েজ নয়। এর মত পাপ আর কিছুই হতে পারে না।

–ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য

বর্তমান দুনিয়ায় এই যে অশান্তি, জুলুম, শোষণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মতবাদ বা রাষ্ট্রনীতিই এর মূল কারণ। আজ পরিস্কার মনে হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার উপর কেবল চোর-ডাকাত, গুণ্ডা ও বদমায়েশদেরই রাজত্ব চলছে এবং তারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ লুটে নেবার জন্য সমগ্র মানুষকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে।

–ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা

যে লোক বিশ্বাস করে জীবন সীমিত, রিযিক সীমিত আর সব কিছু আল্লাহর হাতে– তিনি যেমন ইচ্ছা তার বিলি বণ্টন করেন– সে লোক সত্যের প্রতিরোধ করার সংগ্রামে মৃত্যুকে ভয় করবে কেন? আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনে সে কেন হবে পশ্চাদপদ?

–উন্নত জীবনের আদর্শ

খায়রুন প্রকাশনী